কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি শেষ, ফের জঙ্গি বিরোধী অভিযান শুরু

রমজান উৎসবকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু-কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছিল কাশ্মীরবাসীর দিকে তাকিয়ে। এতে অবশ্যই ঝুঁকি ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে অসাধারণ শিষ্টাচার দেখিয়েছেন। কিন্তু উপত্যকায় জঙ্গি সমর্থকরা এবং পাক রেঞ্জার্সরা তার কোনও মূল্য দেয়নি। বরং এই একমাস যাবত তারা পাল্টা হামলা চালিয়েছে সংঘর্ষ বিরতি এলাকায়। খুন করা হয়েছে সাংবাদিক সুজাত বুখারিকে। পরপর এধরনের ঘটনার পর জম্মু-কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি শেষ করা ছাড়া কোন পথ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে খোলা নেই। এবার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ফের শুরু হল অপারেশন অল আউট। অবশ্যই এই অভিযানের পরিণতি কী হবে, তা কারও অজানা নয়। তবে উপত্যাকাবাসী শান্তি চায়। প্রসঙ্গত রমজান মাস চলার কারণে গত ১৭ মে থেকে একতরফা সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করেছিল মোদী সরকার। কিন্তু এই একমাসে হামলা বন্ধ থাকার কথা তো বহুদূরে, হামলা বেড়েছে ১০০ শতাংশ। শনিবার শেষ হয়েছে খুশির ঈদ। তাই রবিবার থেকেই সংঘর্ষ বিরতি প্রত্যাহারে কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। উল্লেখ, এই সংঘর্ষ বিরতির মধ্যে জঙ্গিরা সেনা জওয়ান ঔরঙ্গজেব এবং রাইজিং কাশ্মীর পত্রিকার সম্পাদক বুখারিকে হত্যা করে। এরচেয়ে নিন্দনীয় আর কিছু হতেপারে না। তবে কাশ্মীরে শান্তিন্ত বিরাজ করুক, এটাই কাম্য।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

মাষ্টার-যে আজ্ঞা।

ভক্তবধূগন এইবারে আসিয়া প্রনাম করিলেন। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আবারা বললেন, “**শিবপূজা** যেমন বললাম ঐরূপ করবে। আর খেয়ে দেয়ে এসো, তা না হ'লে আমার কষ্ট হয়। স্নানযাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা ক'রো।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
বন্দ্যোকে শিক্ষা—ভার্যা সংসারের কারণ—শরণাগত হও

শ্রীরামকৃষ্ণ এই বার পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। **বন্দ্যোপাধ্যায়**, হরি, মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিয়া আছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসারের কষ্ট ঠাকুর সব জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ--দেখ, ‘এক কপ্নিকে বাস্তে’ যত কষ্ট। বিবাহ করে, ছেলেপুলে হয়েছে, তাই চাকরী করতে হয়; সাধু কপ্নি লয়ে ব্যস্ত সংসারী ব্যস্ত ভার্যা লয়ে। আবার বাড়ির সঙ্গে বনিবনাও নাই, তাই--আলাদা বাসা করতে হয়েছে! (সহাস্যে) চৈতন্যদেব নিতাইকে বলেছিলেন, শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই সংসারী জীবের কভু গতি নাই।

মাষ্টার (স্বগতঃ)—ঠাকুর বুঝি অবিদ্যার সংসারের কথা বলেছেন। অবিদ্যার সংসারেই বুঝি ‘সংসারী জীব’ থাকে।

(মাষ্টারকে দেখাইয়া---সহাস্যে) ‘ইনিও আলাদা বাসা করে আছেন। ‘তুমি কে, না আমি বিদেশিনী’; আর তুমি কে, না ‘আমি বিরহিণী।’ (সকলের হাস্য। বেশ মিল হবে।”

“তবে তাঁর **শরণাগত** হ'লে আর ভয় নাই। তিনিই রক্ষা করবেন।”

হরি প্রভৃতি—আচ্ছা, অনেকের তাঁকে লাভ করতে এত দেরী হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ কি জানো, **ভোগ আর কর্ম** শেষ না হ'লে ব্যাকুলতা আসে না। বৈদ্য বলে দিন কাটুক—তারপর সামান্য ঔষধে উপকার হবে।

“নারদ রামকে বললেন, ‘রাম! তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে রাবণবধ কেমন করে হবে? তুমি যে সেই জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে!

দিনপঞ্জিকা

৪ আষাঢ়, ভাঃ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৯ জুন, ৪ আহার, সংবৎ ৬ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ৪ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২২। **মঙ্গলবার,** ষষ্ঠী দিবা ঘ ১১।৪৩ মিঃ। মঘানক্ষত্র দিবা ঘ ৮।২ মিঃ। বজ্রযোগ দিবা ঘ ১।২১ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ১১।৪৩ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ১২।৪৫ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**—সিংহরাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ঘ ৮।২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে** —একপাদদোষ, দিবা ঘ ১১।৪৩ গতে দ্বিপাদদোষ। **যোগিনী**—পশ্চিমে, দিবা ঘ ১১।৪৩ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ঘ ৬।৩৬ গতে ৮।১৭ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ৩।০ মধ্যে। কালরাত্রি ঘ ৭।৪১ গতে ৯।০ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, দিবা ঘ ১১।৪৩ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**- গর্ভাধান সীমন্তোন্নয়ন। **বিবিধ**-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট এবং সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন। **অরণ্যষষ্ঠী (স্কন্দষষ্ঠী)**। আচারবশতঃ **জামাইষষ্ঠী**। সন্তান-সন্ততির মঙ্গলকামনা পূর্ব্বক **শ্রীশ্রী ষষ্ঠীমাতার পূজা কর্ত্তব্য**। **শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীঁমাধবচার্য্য গোস্বামীপ্রভুর আবির্ভাব** তিথি। **বঙ্গের উৎসব ও মেলা—মুর্শিদাবাদ** জেলার সামসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত দোগাছি গ্রামে এই দিনে গ্রামের ত্রয়োস্ত্রীগণ সাড়ম্বরে গ্রাম্যদেবতার পূজা করেন। এবং ডোমকল থানার অন্তর্গত ভাগীরথপুর গ্রামের স্ত্রীলোকগন দইমেলা উৎলব পালন করেন। **অমৃতযোগ**-দিবা ঘ ৭।৪০ মধ্যে ও ৯।২৭ গতে ১২।৮ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৫ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২।৯ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**- দিবা ঘ ২।৪৮ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

৪ আষাঢ়, ভা ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৯ জুন, ৪ শওয়াল, ৪ আহাব, উঃ ৪।৫৪, অঃ ৬।২০, মঙ্গলবার, ষষ্ঠী দি ঘ ৯।৪৬, সেহ্‌রী শেষ ৩।১৯, ইফ্‌তার, ৬।২৮। ৪ শওয়াল-দাদা সাহেবের উরস, বেগুসরাই।

জামাইষষ্ঠীতে দইমেলা উৎসব-ডোমকল মুর্শিদাবাদ।/জামাইষষ্ঠী

মাদককে ‘না’ বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

প্রাকৃত নরনারীর দাম্পত্যজীবনের ঊর্দ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা

গদাধর রানা

শেষ পর্ব

তুমি একান্তমনে আমার আজ্ঞানুবর্তী হও, দেবগুরু বৃহস্পতি তোমাকে আমার সহিত যুক্ত করুন।” বাসরকক্ষে উভয়ে উভয়কে দেখছেন, কারও মনে কোনো দ্বিধাসংকোচ নেই। প্রদীপের আলোয় নববধূকে পতির নিরীক্ষণ করার যে ভাব ও ভঙ্গী তা যে অপ্রাকৃত-ই, অসাধারণ, অদৃষ্টপূর্ব--- যা গ্রাম্য সাধারণ পুরনারীরা কখনও দেখেনি। গভীর সেই নিরীক্ষণের গতি নববধূর অন্তস্থল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়ে তিনি বলছেন, “বেশ তো তুমি, দিব্যি। এই ‘দিব্যি’ শব্দোচ্চারণের মধ্য দিয়ে গদাধর স্বয়ং ঈশ্বর প্রেরিত অবতার হ'য়ে নববধূ সারদার মধ্যে যেন এক দিব্যদর্শন করলেন। ফলে এই হেন নমুনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের ভাবী দাম্পত্যজীবন যে পাঁচজনের মতো হবে না— একথা তো বলা যেতেই পারে। এরকমই হচ্ছে সদ্যঃপরিণীত সারদা-গদাধরের বাসররাত্রির অভিনব চিত্র—যা হ'তে ওঁদের ভাবীমিলন পরম দৈবযোগে এক অনুপম রূপে তামাম জগৎসমক্ষে প্রতিভাত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীশ্রী ঠাকুর ও শ্রীমা সারদার দাম্পত্যজীবন সবটুকুই অলৌকিক ও স্বর্গীয়। সুরভিত কুসুম দেবতার পুজোয় নিজেকে নিবেদিত করিয়া সার্থক হয়। ব্রজের রাধারাণী নিজের দেহ ও প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্ত্যর্থে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া নিজের পৃথক সত্তা ভুলিয়া প্রেমাস্পদে পূর্ণ হইয়াছিলেন। মা সারদাও তাঁহার অভীষ্টকে কায়মনোবাক্যে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াই পূর্ণ, তাঁহার সহিত অভিন্ন ও একাত্ম।

স্বচ্ছসুন্দর দাম্পত্যজীবন বোধে নিজে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আপন সহধর্মিণী বালিকা সারদাকে তাঁদের বিবাহসময়টিকে কীভাবে তিনি নিরূপিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন একবার তা দেখা যাক্। বিবাহ কালে শ্রীমা ছিলেন পাঁচ বছর বয়স উত্তীর্ণা, সবে তখন ছয় বছর শুরু। তখন ঠাকুর ছিলেন চব্বিশ বছরের যুবক। ঠাকুর বুঝেছিলেন—সারদা স্বয়ং তাঁর ঐ হেন কম বয়সে তাঁদের বিবাহ ঘটনা পরিস্থিতিকে হয়তো ততটা আর স্মরণ করতে পারবে না। তাই সারদার সাত বছর বয়সের বেলায় ঠাকুরের জোড়ে যাবার সময় পাছে শ্রীমা এই জোড়যাত্রাকেই বিবাহ জ্ঞানে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, সেজন্য ঠাকুর সারদাকে বলেছিলেন, তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ক' বছরে বে হয়েছে, তখন পাঁচবছর ব'লো। সাতবছর ব'লো না। ঠাকুর পরস্পরের দাম্পত্য জীবনের শুরু হতেই পারস্পরিক বোধশক্তিকে কতটা সংহত রাখতে প্রয়াসী ছিলেন—উক্ত ব্যক্তব্যের নমুনা হতেই তা বোঝা যায়।

ওঁদের দাম্পত্য জীবন যে প্রকৃতই কতটা অপ্রাকৃত মাপের ছিল তা আমরা এক্ষণে উপলব্ধি করতে পারি। একবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন যে শাস্ত্রসম্মতভাবে যাঁহাকে তিনি পত্নীত্বে স্বীকার করিয়াছেন, স্বগৃহে যিনি সর্বক্ষণ তাঁহারই আয়ত্তে রহিয়াছেন, সেই পত্নীর আকর্ষণ তাঁহার চিত্তের বিকার হয় কিনা অথবা পত্নীই তাঁহাকে ভোগের পথে আকর্ষণ করেন কিনা এবং আকর্ষণ করিলে তাঁহার আত্মরক্ষার প্রবল শক্তি আছে কিনা।

ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি মা সারদাও পতির এই প্রকার পরীক্ষার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছোনোর পরে এতদিন নহবতখানায় বাস করছিলেন। পতির আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে নহবত হ'তে মা সারদা পতির কক্ষে গিয়ে একদিক্রমে দীর্ঘদিন রাত্রিযাপন করেছেন। কিন্তু বিবাহিত পতি পত্নী হয়ে তাঁদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক কখনও ঘটেনি। এই সাফল্যের কৃতিত্ব কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের একার নয়, মা সারাদারও অবশ্যই। সার্থকভাবে প্রাকৃতজগতের দম্পতি হওয়া সত্বেও কী অনুপম চেতনায় কী অপূর্বভাবে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনের উর্দ্ধে উঠে ওঁরা উভয়েই অপ্রাকৃত ভাবধারার মধ্য দিয়ে পরস্পরে সন্তুষ্টচিত্ত ও

দেবোপমভাবযুক্ত। বাস্তবিকই এঁদের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ দেবদুর্লভ বস্তুই বটে।

আমরা জানি— ঠাকুর নারী মাত্রেই মাতৃভাব পোষণ করতেন বলেই পত্নীতে ব্রহ্মময়ীভাবের উপলব্ধিতে ষোড়শীপুজো সমাপনের দ্বারা স্বীয় অন্তরের মধ্যে মহাভাবের পুনর্ঘটস্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন--এ সকলি আজ ইতিহাস। এছাড়াও আমরা জানি, পতির পদসেবা করা কালীন পত্নীর মুখে “আমাকে তোমার কী মনে হয়” প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুরের মুখনিঃসৃত “যে মা মন্দিরে আছেন সেই মা-ই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন এবং আজকাল নহবতে বাস করিতেছেন আবার তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। আনন্দময়ী মায়ের প্রত্যক্ষমূর্তি বলিয়াই তোমাকে সর্বদা দেখিয়া থাকি।” এই হেন ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধযুক্ত কালজয়ী উক্তিটি ঠাকুরের জাগতিক ক্ষেত্রের দাম্পত্যজীবনের চলমান্ ভিতকে নাড়া দিতে পেরেছিল। এ তো গেল পরস্পরের দাম্পত্যজীবনে ঠাকুরের চোখে মাকে দর্শন। তেমনি পত্নীও তাঁর পতিকে নানাভাবে দর্শন করেছেন। ‘দেবপত্নিজ্ঞানে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, নিজেকে বিশ্বজননীবোধে ঠাকুরকে সন্তানবৎ স্নেহ করেছেন। আবার আপন পতিদেবতার মধ্যেই মা কালীর রূপও তিনি দর্শন করিয়া ধন্য হয়েছেন। এমনই হচ্ছেন যুগলমূর্তিতে অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাসারদার দাম্পত্যজীবনে একাত্মতার পরিচয়।

তাঁদের দাম্পত্যজীবনের মধ্যে আবেগী, প্রাণস্পর্শী তথা মধুমাখা কালী, ঠাকুর শ্রীমাকে বলেছেন, লক্ষ্য করা যাক্। শ্রীমা কামারপুকুরে এবং জয়রামবাটীতে প্রায়ই মেয়েদের কাছে শুনতেন। “ছেলের মা না হ'লে কোনো কাজই যে মেয়ে মানুষ করতে পারে না। বাঁধা কোনো শুভ কাজেই এয়ো হতে পারে না। সেই ছেলেমানুষ বয়সে এসব শুনে মায়ের খুব দুঃখ হতো। মা ভাবতেন—তাঁর কি তবে একটিও ছেলে হবে না? দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পৌঁছানোর পরে মায়ের একবার ঐ কথাটি মনে পড়েছে। কউকে কিছুই বলেননি তিনি। যেদিনেই একথা মায়ের মনে হয়েছে। ঠাকুর আপনা হতেই শ্রীমাকে বলছেন, “তোমার ভাবনা কিসের? তোমায় এমন সব রত্ন ছেলে দিয়ে যাবো—মাথা কেটে তপিস্যে করেও মানুষে পায় না। পরে দেখবে এত ছেলে তোমায় মা ব'লে ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হ'য়ে উঠবে।” প্রকৃত নরনারীর মতোই হয়তো অনেকটাই ওঁদের দম্পত্যজীবনে বাহ্য চলাফেরা ছিল—তা সত্বেও ঠাকুর মাকে ভবিষ্যৎ দুরদ্রষ্টা হ'য়ে কী হৃদয়গ্রাহী সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, যা সত্যিই ভবিষ্যতে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল।

দাম্পত্যজীবনে স্ত্রীরা স্বামীদের কাছে অলংকারের প্রত্যাশা করেই, মাসারদাও ব্যতিক্রমী নন। জীবদ্দশায় ঠাকুর মাকে পরবার জন্য অলংকার দিয়েছিলেন। তবুও ঠাকুরের ত প্রকট হওয়ার পরে পতিভক্তির কারণে সুখকর দাম্পত্যজীবনের ময্যাদারক্ষায় শ্রীমা তাঁর হাতের দুখানি বালা বাদে ঠাকুরের পুন্যস্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষার্থেই সমস্ত পার্থিব অলঙ্কার খুলে ফেলেছিলেন। ঠাকুরের অপ্রকট হওয়া সত্বেও শত পার্থিব শূন্যতাকে মেনে নিয়েও শ্রীমা কর্তৃক তাঁদের এ যাবৎ সম্ভোগকৃত দাম্পত্যজীবনের প্রেম এবং ভালোবাসার কী অনুপম স্বীকৃতি!

দাম্পত্যজীবনের কী অদ্ভুত আকর্ষণ তাঁদের! মা নিজেই বলেছিলেন, ‘আমি থাকতুম বটে নহবতে, কিন্তু প্রাণ মন সর্বদা ঠাকুরের ঘরেই পড়ে থাকত। সেখানে কী হচ্ছে শোনবার জন্যে উৎকর্ষ হয়ে থাকতুম। লক্ষ্মী, গৌরদাসী, গোপলের মা এদের দিয়েও খবর নিতুম। নহবতে বারান্দায় যে দরমার বেড়াক ছিল, তাঁর জায়গায় জায়গায় ফাঁক করে রেখেছিলুম, তার মধ্যে দিয়ে ঠাকুরকে এবং তাঁর সব কাণ্ডকারখানা দেখতুম। বেড়ার ফাঁক ক্রমশঃ বড় হচ্ছে দেখে শেষে কিনা ঠাকুর একদিন হাসতে হাসতে বললেন, ‘ও রামনেলো, তোর খুড়ীর বাড়ির বেড়ার ফাঁক যে দিনকে দিন বেড়েই চলেছে, শেষ পর্যন্ত আবরুর অস্তিত্বটুকু থাকবে তো রে।” শুনে লজ্জায় মরে যেতুম। কিন্তু না দেখেও থাকতে পারতুম না। প্রকৃত জীবনে বাস করেও তাঁদের কী তীব্র, আপ্রাকৃত আকর্ষণ পরস্পরের। অথচ একদিন এই আনন্দমেলাও ভেঙে গিয়েছিল। কী অদ্ভুদ স্বর্গীয় স্তরের ব্যবহারিক কথাবার্তা তাঁদের! ঠাকুর ছিলেন প্রকৃতই রসিক চূড়ামণি। একটি দিনের জন্যও ঠাকুর সজ্ঞানে শ্রীমাকে বাজে কথা বলেননি। মা বলেছেন, “ঠাকুর একদিনের জন্যেও তাঁকে ফুলটি দিয়ে পর্যন্ত আঘাত করেননি।” মায়ের একবার মাথা ধরেছে, ঠাকুর ভাইপো রামলালকে ডেকে বলছেন, “ওরে রামনেলো, দেখ্ না রে, তোর খুড়ীর মাথা ধরলো কেন রে? কী অদ্ভুদভাবে পরস্পরের প্রতি তাঁদের ভালবাসা, বড় গভীর। এ সকলি তো শান্তসুন্দর দাম্পত্যজীবনেরই নমুনা, যদিও এ সকলি প্রাকৃতি জীবনেই ঘটে, তবুও সকলেই তা পারে কি?

সদারঙ্গময় শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহের পরে কামারপুকুরে প্রায় দুই বৎসরাধিক কাল অবস্থান করে মাকে প্রচুর সাংসারিক ক্ষেত্রের পক্ষে উপকারী উচ্চশিক্ষা দিতেন এবং এসব শিক্ষাপ্রদানের মধ্যে দিয়েই ওঁদের স্বর্গীয় দাম্পত্যজীবনের ভাবীকালের বীজ প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। শ্রীঠাকুরের ভ্রাতুস্পুত্রী লক্ষ্মীদিদি সংসারে জনৈক , সাধুকে বলেছিলেন--“বৈরগ্য ও ভগবদ্‌ভক্তিই সার।” বলতেন, “শেয়াল কুকুরের মতো কতকগুলো বাচ্চাকাচ্চা বিইয়ে কি হবে?” জাগতিক দৃষ্টিতে আর পাঁচজন প্রকৃত নরনারীর দাম্পত্যজীবনের মতোই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী—কিন্তু এই তাঁদের আসল পরিচয় নয়। আসলে তাঁরা এযুগে জীবোদ্ধার কার্যে পরস্পরের সহায়ক। আমরা জেনেছি, শ্রীমা বলবেন, “তিনি ও ঠাকুর একই, কোনো পার্থক্য নাই। শুধু রূপেরই পার্থক্য। শ্রীসারদামা ঠাকুরের বুকের অনন্ত করুণাধারাকে জগতে প্রবাহিত করেছেন। সত্যের সাগর মন্থন করে ঠাকুর যে আমৃত তুলেছিলেন, শ্রীমা হচ্ছেন সেই পরম অমৃতস্বরূপা। ঠাকুরের সাধনায় অবশ্যম্ভাবী ফল শ্রীশ্রী সারদামণি দেবী মাতাঠাকুরাণী।

ভগবানের গুরু

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

গুরু এবং ভগবান ভেদ নাই। যিনি ভগবান তিনিই গুরু। সদ্‌গুরু ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন। ভগবানকে তো ধরা-ছোঁয়া বা দেখা-শোনা যায়না , তাই তখন নরদেহধারী সিদ্ধগুরুকে ইষ্টপদে অভিষিক্ত করা হয়। গুরু ভিন্ন জিবের গতি-মুক্তি নাই। যিনি গতি-মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন এবং শিষ্যকে মুক্ত করে দেন তিনিই প্রকৃত গুরু। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়-- “ইষ্ট দর্শনের সময় গুরু সামনে এসে পরেন, আর বলেন, ওই দেখ্ তোর ইষ্ট। তারপর গুরু ইষ্টে লীন হয়ে যান। যিনি গুরু তিনিই ইষ্ট। গুরু খেই ধরে দেন। ... যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরু রূপ হয়ে আসেন।”প্রকৃতপক্ষে গুরুই শিষ্যের সর্বতোমঙ্গলাকাঙ্খী, গুরুই সর্বজ্ঞ, দয়াময় ও কল্পতরু। মন্ত্রদাতা গুরুই ধর্মাধর্ম পথপ্রদর্শক ও মুক্তি দাতা। শিক্ষা গুরু অনেকে হতে পারেন, কিন্তু দীক্ষাগুরুই যথার্থ গুরু। তিনিই উপসনার বিধি দেন এবং মুক্তির পথ দেখান।

শাস্ত্রবিধির মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই অন্যকে গুরুপদে বরণ। অনেকের ধারণা, অবতারপুরুষ স্বয়ংসিদ্ধ, তাঁর আবার দীক্ষা-শিক্ষা, সিদ্ধি-সাধনা কি? কিন্তু অবতার পুরুষগণও গুরুকরণের পক্ষপাতি ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্টের নিকট, শ্রীকৃষ্ণ সন্দিপনী মুনির নিকট, মহর্ষি ব্যাসদেব শঙ্করের নিকট,শঙ্করাচার্য গোবিন্দপাদের নিকট, শ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ভগবান রামকৃষ্ণের জীবনেও গুরুকরণ হয়েছিল এবং বিশেষ বিশেষ সাধনোপায় ও সত্যোপলব্ধির জন্য বহু গুরুগ্রহণ হয়েছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়ে “মন্ত্রদাতা গুরু এক, তবে উপগুরু বা শিক্ষাগুরু অনেক করা যেতে পারে, যার কাছে কিছু শিক্ষাপাই, তিনিই উপগুরু”—এ বিষয়টি শ্রীমদ্ভাগবতের অবধূতো পাখ্যানের কথা তুলে বুঝিয়ে বলতেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, “বহুগুরুর নিকট উপদেশ শ্রবণ করলেও ঠিক ঠিক সাধকের শ্রীগুরু মাত্র একজনই হয়ে থাকেন।” ত্রিভুনে যিনি দীক্ষা দিয়ে বেড়ান, জগতের যিনি পরমগুরু, সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকেও কে দীক্ষা দিলেন? কে সেই মহাভাগ্যবান গুরু? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের যে মাতৃসাধনা সমগ্র অধ্যাত্মজগতে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করে পৃথিবীর এক বিপুল কল্যাণ সাধিত করলো, ধর্মবোধ এবং ধর্মচেতনার এক নতুন সংজ্ঞার সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে পূর্ণতা, সফলতা, সার্থকতার সন্ধান দিলো। অসংখ্য দ্বিধা, সংশয়, অস্পষ্টতার নাগপাশ থেকে মানুষকে উদ্ধার করে গভীর প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত এক আলোকোজ্জ্বল মানসিকতায় সমুদ্ভাসিত করে তুললো— সেই মাতৃসাধনার সর্বপ্রথম যিনি ঋত্বিকের ভূমিকা নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণজীবনবৃত্তে তিনি এক অবশ্য স্বরণীয় নাম।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু হলেন কেনারাম ভট্টাচার্য ওরফে শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দ। এই গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটি একমুখী নয়, উভয়মুখী—শিব ও রামের সম্পর্কের মতো। কেন না শিব রামের গুরু, আবার রামও শিবের গুরু। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন, “শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব। শিব কখনও সমাধিস্থ, কখনও রাম রাম করে নৃত্যু করছেন” (কথামৃত ৫/৮/২)। শিবই কেবল রামের ভজনা করেন না, রামও শিবের ভজনা করেন। কুলগুরু কেনারাম ভট্টাচার্য জগন্মাতার দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসাধনার জন্য দক্ষিণেশ্বর পূর্ব থেকেই যেন স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েই ছিল। কালীবাটীতে অতিথি, ফকির, সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতদের থাকবার ও খাবার বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। গুরু কোনারাম তখন অনুরাগী শক্তিসাধক মাত্র। গৃহী, একমাত্র কন্যা সন্তানের জনক। গ্রাম ছেড়ে কলকাতার বৈঠকখানা বাজারে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। মথুরবাবু প্রমুখ সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। রামকুমারের সঙ্গেও ইনি পূর্বপরিচিত ছিলেন (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ অধ্যায়)। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পরিবারের কুলগুরু ছিলেন কেনারাম। মহাত্মা ক্ষুদিরামের অভীষ্টদেব ছিলেন কেনারামের পিতা রামপ্রসাদ। সেই কারণে রামকুমার, রামেশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখেরা প্রত্যেকে একসময়ে কুলগুরুর কাছে বিষ্ণুমন্ত্রে ও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কুলগুরু বালক গদাধরকে গায়ত্রীমন্ত্রে প্রথম দীক্ষা, রামমন্ত্রে দ্বিতীয় দিক্ষার পর তন্ত্রমতে দেবীপূজার অধিকারী হওয়ার জন্য ১২৬২ বঙ্গাব্দে মাত্র ১৯ বছর বয়সে বালক গদাধর দক্ষিণেশ্বরে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। দীক্ষাগ্রহণ করামাত্র গদাধর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হন। বালকের অসাধারণ ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গুরু কেনারাম ইষ্টলাভ বিষয়ে প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করলেন। তখন তিনি মাতৃপূজার বীজমন্ত্রটি গদাধরকে দেন। সেই বীজমন্ত্রই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসাধনার চাবিকাঠি। এরপর মা ভবতারিণী স্বয়ং তাঁর সন্তানের সকল ভার নিজ হাতে তুলে নেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দীক্ষাদানের পর গুরু কেনারাম সপ্ততীর্থাদি দর্শনান্তে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে ফেরার পথে সদ্‌গুরুর কাছে পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে ‘স্বামী পূর্ণানন্দ’ নামে সন্ন্যাস প্রব্রজ্যায় দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় আগমণ করেন এবং দীর্ঘ ছয়মাস অতিবাহিত করেন। গুরু কেনারামের তখন সন্ন্যাসীবেশ, শান্তমূর্তি, বেশ মোটা-সোটা, বৃদ্ধ অথচ সুপুরুষ—‘স্বামী পূর্ণানন্দ’ দৈবপ্রেরিত হয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর রক্ষা করবার জন্য কালীবাটীতে আগমণ করেন। সে সময় সন্ন্যাসীদের পরিচয় জানার তেমন কোনো সুযোগ না থাকায় কেউই কেনারামকে চিনতে পারেন নি। বিশেষতঃ পূর্ব নাম-ধাম-গোত্রাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সন্ন্যাসীরা উল্লেখ করেন না। বলেন, “সন্ন্যাসীকে ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং সন্ন্যাসীর তদ্বিষয়ে উত্তর দেওয়া—উভয়ই শাস্ত্রনিষিদ্ধ।”

লীলা প্রসঙ্গকার এই সত্য স্বীকার করেছেন এবং তাঁকে ‘যোগীসাধু’ বলে অভিহিত করেছেন। যোগসাধনা বা শ্রীভগবানের সঙ্গে একত্বানুভবের কারণে তখন দেহধারী শ্রীরামকৃষ্ণের জড়প্রায় মৃতকল্প অবস্থা। গুরু পূর্ণানন্দ শিষ্য রামকৃষ্ণকে জোর করে খাইয়ে দেওয়া, সময়ে সময়ে মেরে ধরে একটু আধটু হুঁশ আনার নিত্য চেষ্টা করতেন। একটু হুঁশ এলেই দু-এক গ্লাস যা পারতেন খাইয়ে দিতেন। এই ভাবে জগদম্বার সাক্ষাৎ ইচ্ছা ও শক্তিতেই গুরু পূর্ণানন্দ উত্তম আচার্যের কাজ করে শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর রক্ষা করেছিলেন। গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন, “তোমার শরীরটার দ্বারা ঁ জগন্মাতার বিশেষ কোনো কার্য আছে, তাই তিনি তোমাকে এই রূপে রক্ষা করেছিলেন ”(লীলাপ্রসঙ্গ ৩ অধ্যায়)।

এরপর গুরু পূর্ণানন্দ ১২৭৭ বঙ্গাব্দে মহাকালীর দর্শন ইচ্ছায় জন্মভূমি (কামারপুকুরের উত্তরদিগবর্তী বেঙ্গাই গ্রাম) পরিভ্রমণে আসেন। এই সময়ে কামারপুকুরে এসে তিনি লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, ভাইঝি লক্ষ্মীমণিদেবী, শিহড়ের মহেশ চাটুজ্জ্যের পুত্র শিবনান্দ সরস্বতী প্রমুখকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

জন্মভূমিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাকালীমন্দির আজও বর্তমান। স্থানটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা প্রমুখের পদধূলিরঞ্জিত। এখানে স্বল্পকাল অবস্থান করে গুরু পূর্ণানন্দ পুনরায় সন্ন্যাস প্রব্রজ্যায় নির্গত হন। অনুমান করা হচ্ছে, এরপর জনজীবনে গুরু পূর্নানন্দের আর ফিরে আসা সম্ভব হয়নি।

গুরু জন্মে জন্মে শিষ্যের নিত্যপ্রভু এবং নিত্যসেবক। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ একজেন্মই শেষ হয়ে যায় না। গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্কবন্ধন কোনো অকস্মিক ব্যাপার নয়— শিব ও রামের সম্পর্কের মতো। শ্রীভগবানই আকৃষ্ট করে শিষ্যকে সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন এবং শিষ্যের অন্তরে সদ্‌গুরুর প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন। গুরু পূর্ণানন্দ ও শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে গৌণ মনে হলেও প্রকৃত দীক্ষাগুরু প্রথম জগন্মাতার আদিষ্ট দ্বারীরূপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্ম জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আজ শ্রীরামকৃষ্ণকে মঠ ও মিশনে লক্ষ লক্ষ ভক্তজনেরা ‘ঈশ্বরের অবতার’ বলে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর প্রতিমূর্তি ও চিত্রাদিতে রীতিমতো ভোগরাগাদি দিয়ে পূজা-অর্চ্চনা করেন, তাঁদের কর্তব্য হলো— এই ভগবানের গুরুর প্রতি সর্বাগ্রে মস্তক অবনত করা এবং তাঁর চিরপূজ্য মহিমাকে সম্মান দেওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই লিখে গেছেন, “গুরুরও গুরু— মানুষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্যতীত অন্য কোনোরূপে আমরা ঈশ্বরের দেখাপাইতে পারিনা। তাঁহাদিগকে পূজা না করিয়া আমরা থকিতে পারিনা, একমাত্র তাঁহাদিগকেই আমরা পূজা করিতে বাধ্য।”

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য ‘আর্থিক লিপি’ কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলেরবিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়